আলোয় ঢাকা অন্ধকারে সুকুমার রায়

সুস্নাত চৌধুরী

মোটামুটি দুটি ধাঁচায় সুকুমার রায়কে আঁটিয়ে ফেলা গিয়েছে। প্রথমত এবং প্রাথমিকভাবে তিনি ছোট ছেলেদের লেখক, হাসির কারবারি, মজার ম্যাজিশিয়ান। দ্বিতীয়ত এবং মাধ্যমিকভাবে (মানে, যাঁরা নিদেনপক্ষে ক্লাস টেন পাস দিয়েছেন বা তাঁর চেয়ে বড়ো লোক!) – তাঁর লেখা শুধুই হালকা ছড়া নয়। তার মধ্যে অনেক ভারী কথাও আছে। সেই সূত্র ধরে সুকুমারের গবেষক মন, বিজ্ঞানমনস্কতা, ফটোগ্রাফি ও প্রিন্টিং সংক্রান্ত কাজকর্ম, সমাজ সচেতনতা, সম্পাদনার দায়িত্ব, ইলাস্ট্রেশন— এমন বহু 'জ্যাঠা' বিষয় উঠে আসে।

সুকুমার নিজে 'জীবনের হিসাব' —এ লিখেছেন, 'বাহির হইতে জীবনটাকে নানারূপ মতামতের সূত্রে গাঁথিয়া, তাহাকে নানা থিয়োরি'র নির্দিষ্ট স্তর ও পর্যায়ে ফেলিয়া, নানা নামধারী বিশেষ বিশেষ খোপের মধ্যে পুরিয়া, তাহার সম্বন্ধে নানারকম সহজ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি; কিন্তু ভুলিয়া যাই যে, যাহাকে লইয়া নাড়িচাড়ি, লেবেল মারি, তাহা জীবন নয়, জীবনের কতগুলি খন্ড পরিচয় মাত্র, জীবনস্রোতের ফেনোচ্ছ্বাস মাত্র। আসলে যাহা জীবনের যথার্থ পরিপূর্ণ হিসাব, তাহা তর্কাতীত সত্যের, জীবনের রহস্যের মধ্যে নিহিত থাকিয়া যায়'। তা সেই যাই হোক, আমাদের হিসেবের বাইরে তাঁর বহুমুখীনতা (সত্যিই স্ত্রৈণ? নিজের বিয়ের সম্বন্ধের প্রশ্নে সুকুমার নাকি বলেছিলেন, 'সুন্দর - টুন্দর জানি না, দেখতে খারাপ না হলেই হল। গান গাইতে পারলে ভালো হয়, আর ঠাট্টা - তামাশা করলে যেন বুঝিয়ে বলতে না হয়!') থাকলেও, যে দুই বৃত্তে তাঁকে পাকড়ানো গিয়েছে, তা আংশিক যদি বা হয়ও, তবু সত্য। সম্ভবত 'তর্কাতীত সত্য'ও। প্রথমটি, অর্থাৎ তিনি হাসির কারিগর—এ নিয়ে তো কারো প্রশ্ন থাকতে পারে না। (ঠিক কিনা? ঠিক) স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পাগলা দাশু'-র ভূমিকাতেই তো লিখছেন, 'সুকুমারের লেখনী থেকে যে অবিমিশ্র হাস্যরসের উৎসধারা বাংলা সাহিত্যকে অভিষিক্ত করেছে তা অতুলনীয়'। দু-লাইন ছেড়ে ফের লিখছেন, 'বঙ্গ সাহিত্যে ব্যঙ্গ রসিকতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আরো কয়েকটি দেখা গিয়েছে কিন্তু সুকুমারের অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাসের বিশেষত্ব তাঁর প্রতিভার যে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছে তার ঠিক সমশ্রেণীর রচনা দেখা যায় না'।

এই ভূমিকাই শেষ হচ্ছে টুইস্টে, 'তাঁর এই বিশুদ্ধ হাসির দানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অকাল মৃত্যুর সকরুণতা পাঠকদের মনে চিরকালের জন্য জড়িত হয়ে রইল'। রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক দৃষ্টির অপসারী শঙ্কু (প্রকৃত প্রস্তাবেই যা ত্রিলোকেশ্বর!) সুকুমার রায়ের কারুণ্যের আন্দাজ পাবে না, তা হয় না। হয়নি। কিন্তু, '২/৬/৪০' তারিখে, অর্থাৎ সুকুমারের মৃত্যুর প্রায় সতেরো বছর পর লেখা ভূমিকায় শুধু 'অকাল মৃত্যুর সকরুণতা'? বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়, 'অকালমৃত্যুর বেদনাজড়িত সেই বিস্ময়'। তাহলে কি রবীন্দ্রনাথও গোটা গল্পটা আঁচ করতে পারেননি? 'গল্পসল্প' তখনও লেখা না হলেও, 'সে' কিংবা 'খাপছাড়া' তো সারা। সুকুমারকে তাঁর মতো করে বুঝেছিলেন ক-জন! যে সুকুমারকে মৃত্যশয্যায় গান শুনিয়েছিলেন। মৃত্যুর পর যাঁর সহধর্মিনী সুপ্রভা দেবীকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'মৃত্যুকে তিনি মহীয়ান করে, তাকে অমৃতলোকের সিংহদ্বার করে দেখিয়ে গেছেন, আমরা যারা মর্ত্তলোকে আছি, আমাদের প্রতি তাঁর এই মহার্ঘ্য দান'। মৃত্যুর অন্ধকার কি তবে মরণ- পারের ঘোর আলোয় চোখে লাগা ঘোর ছিল? ধাঁধা ছিল? মৃত্যু প্রসঙ্গে এসেছে সুকুমার মারা যাওয়ার মাত্র তিন দিন পর শান্তিনিকেতনের ভাষণে, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'দিনের বেলাটা কর্ম দিয়ে ভরাট থাকে। রাত্রি যখন আসে, শিশু তখন ভয় পায়, কাঁদে। প্রত্যক্ষ তার কাছে আচ্ছন্ন হয়ে যায় বলে সে মনে করে সবই বুঝি গেল। কিন্তু আমরা জানি, ছেদ ঘটে না, রাত্রি দিনকে ধাত্রীর মত অঞ্চলের আবরণের মধ্যে পালন করে।...অন্ধকারের মধ্যে নিখিল বিশ্বের ব্যঞ্জনা যেমন, মৃত্যুর মধ্যেও পরমপ্রাণের ব্যঞ্জনা তেমনি।' এক্কেবারে শেষে ফের লিখছেন,

'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে,
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।।'

যা নাকি পৃথিবীর সমান্তরাল মৃত্যুশয্যায়, শুয়ে, অসুস্থ সুকুমার গাইতে বলেছিলেন। কিন্তু, মৃত্যু কি ঠিক একরকমই ছিল সুকুমারের কাছে? রবীন্দ্রনাথ খোদ দেখেছেন, 'প্রাণ যাকে পরম শত্রু বলে জানে, তাঁকেও তিনি পরিপূর্ণ করে দেখতে পেরেছেন'। 'পরিপূর্ণ' মানে? রবীন্দ্রনাথের 'ভুল' ধরা অসম্ভব না-ও হতে পারে, ধৃষ্টতাও না হতে পারে। কিন্তু তাঁর ভুল 'ধরতে যাওয়া' সম্ভবত এক বিরাট ধৃষ্টতা! (এ কলমচির কাছে তো বটেই।) বরং সুকুমারের মৃত্যু ভাবনা শুধুই 'গভীর শান্তি এ যে' কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। তাঁর জীবনে কি আদৌ কারুণ্যের উপস্থিতি ছিল? বিষাদ? নাকি ফুর্তিই ছিল আলটিমেট? তবে কি সবটা বোঝা যাচ্ছে না মানুষটাকে?

সুকুমার রায়ের যে চেনা বা আপাত চেনা ছবিটা আমাদের কাছে রয়েছে, তাতে দুঃখের ছিটেফোঁটা উপস্থিতিও স্বীকার করতে বাধে। তার কারণ আমাদের সরল অঙ্কে হাসি ইজ ইকুাল টু আনন্দ, কান্না ইজ ইকুয়াল টু দুঃখ! সেখানে নিয়তি - নির্ধারিত মৃত্যুকে বড়জোর স্বীকার করা যায়— তাও, যে মৃত্যু মহৎ, যেখানে 'অনন্ত জাগে', সেই মৃত্যু। অথচ কী আশ্চর্য, এমন মানুষের জীবনেও ঘাপটি মেরে ছিল মৃত্যুভাবনা! পোশাকি নয়, একেবারে র কারুণে

যা ভরপুর। তাঁর লেখাতেও আগাগোড়া হাজিরা দিয়ে গিয়েছে বিষাদের সুর। শুনতেই পাইনি। অট্টহাসির চোটে সে প্যাথোস ডপলার এফেক্টের বদলে যাওয়া কম্পাঙ্ক হয়ে, শেষমেশ হারিয়ে গিয়েছে।

ননসেন্স সৃষি করার নামে এক সে এক ট্রাজিক চরিত্র বানিয়ে গিয়েছেন সুকুমার রায়। হিন-হাসির কথায় প্রথমেই আসুক হুঁকোমুখো হ্যাংলা। মুখে তার হাসি নেই, কিন্তু সুকুমারের প্রশ্ন, 'কেউ কভু তার কাছে থেকেছ?' অর্থাৎ কিনা, থেকে দেখেছ? সত্যিই তো, আমরা যারা হাসির খোরাক পেতে সুকুমারের বই উলটেছি, হুঁকোমুখোর কাছে তো তারা কেউ থাকিনি। থেকে, বুঝতে চেষ্টা করিনি হুঁকোমুখোর দুঃখ-দুর্দশার কথা। 'তাই বুঝি একা সে/ মুখখানা ফ্যাকাসে/ ব'সে আছে কাঁদো কাঁদো বেচারা'— 'একা' হুঁকোমুখোকে ফেলে আমরা পালিয়ে এসেছি— আমাদের মুখ দেখানোর পথ নেই।

এমনই আরেকজন। রামগরুড়ের ছানা। যাদের জীবনে হাসির চিহ্নমাত্রও নেই। হাসি নিষেধ। এমন এক বিচিত্র অবস্থায় আমাদের বেদম হাসি পায়। স্বাভাবিক। স্রষ্টার এক্সেলেন্স এখানেই! কিন্তু, ভেবে দেখুন তো একবার, এদের কথা। সোয়াস্তি নেই মনে—/ মেঘের কোণে কোণে/ হাসির বাষ্প উঠছে ফেঁপে/ কান পেতে তাই শোনে!' তারা হাসতে পারছে না; কান পেতে, আড়ালে, বাধ্যত, হাসির বাষ্পের ভেসে আসা শব্দ শুনতে হচ্ছে এ লেখার প্রাথমিক খসড়ায় আরও একটি স্তবক ছিল, যা পরে বাদ যায়। 'হাসির গন্ধ পেয়ে / স্বপ্নে তাদের মেয়ে/ 'হাসছ?' বলে চমকে ওঠে/ চাঁদের পানে চেয়ে।' জানি না, ফ্রয়েড সাহেব কী ব্যাখ্যা দেবেন। কিন্তু চাঁদের হাসির বাঁধ উছলে পড়া আলোও কী বিষম এই মেয়েটির কাছে! চাঁদের গায়ের হাসি- হাসি গন্ধ ঘুমের মাঝেও চমকে দেয় তাকে। এখানে ভেবে দেখার কথা, সুকুমার রায় কিন্তু মোটেও সাংবাদিকের কাজটুকুই করছেন না। রীতিমতো পক্ষ নিয়ে ফেলেছেন। আমাদের বলছেন, 'হাসতে-হাসতে যারা/ হচ্ছে কেবল সারা/ রামগুরুড়ের লাগ্‌ছে ব্যথা/ বুঝছে না কি তারা?'

কিংবা ট্যাঁশগরু। হারুদের অফিসের এই পাখিটি অ্যানিমেল কিংডমের একটি রেয়ার স্পিসিস। তাকে দেখার জন্য রীতিমত আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন তিনি। তার অদ্ভুত দক্ষতা, বিবিধ বিশেষত্বের প্রসঙ্গ আনছেন। কিন্তু সেসব এতই স্ট্রং, যে কবি সুকুমার নির্দ্বিধায় ব্যর্থ হচ্ছেন—'বর্ণিতে রূপ গুণ সাধ্য কি কবিতার/চেহারার কি বাহার— ঐ দেখ ছবি তার।' 'কবিতা' ফর্মটিকেও এক অর্থে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন তিনি! শিল্পী সুকুমার বরং এখানে অনেক আত্মবিশ্বাসী! তিনি আবারও কনফেস করেছেন— 'মাঝে মাঝে' কেঁদে ফেলে না জানি কি খেয়ালে'। 'না জানি' কথাটির প্রয়োগ কি সচেতন নয়? সত্যিই তিনি জানেন না ট্যাঁশগরুর অন্তরের দুই ভারি কহানি। বরং যা জানেন, তা ট্যাঁশগরুর আচমকা রেগে ওঠার কথা, তেড়ে যাওয়ার কথা, দাঁতে দাঁত লেগে বিপর্যস্ত হওয়ার কথা। এসবের নেপথ্যের কার্যকারণ সম্পর্ক তিনি আঁচ করতে পারেন না; পারেন, এর অসহায়তার আঁচ উস্কে দিতে। পারেন, একদিন ন্যাকড়ার ফালি খেয়ে ফেলে তিন মাস আধমরা হয়ে পস্তানোর কথা শোনাতে। শক্তিশালী ডাইনোসোরের পৃথিবী থেকে ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে যাওয়া যেমন এক আশ্চর্য ট্র্যাজেডি, বিচিত্র ট্যাঁশগরুর এমন দুর্বল ইমিউনিটি-রহিত জীবনও তেমনই এক সোয়ানসং -এর ইঙ্গিতবাহী।

আজিব জীবরেন অন্যতম কিম্ভূত। তার ঘ্যান-ঘ্যান আবদার, ঘন-ঘন নালিশ। ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স থেকে শেষ পর্যন্ত ভয়ঙ্কর এক আইডেন্টিটি ক্রাইসিসের সূত্রপাত। ''নই ঘোড়া, নই হাতি, নই সাপ বিচ্ছু,/ মৌমাছি প্রজাপতি নই আমি কিচ্ছু।/ মাছ ব্যাং গাছপাতা জলমাটি ঢেউ নই,/ নই জুতো নই ছাতা, আমি তবে কেউ নই!" কিম্ভূত তবু ঠেকে শেখে। তার একাকিত্বের প্রতি, সব পেয়েও কিচ্ছু না পাওয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া যায়। কিন্তু, যখন সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সের শিকার হয় হাঁড়িচাঁচা? এবার আর কল্পরাজ্যের নাগরিক নয়, বাস্তব জগতে আমাদের সহবাসিন্দাটিরই প্রসঙ্গ উঠে পড়ে। মনে হয়, বেশ হয়েছে! দ্যাখ কেমন লাগে! সুকুমার লেখেন, 'এতক্ষণে বুঝতে পারি ব্যাপারখানা কি যে—/ সবার তুমি খুঁত পেয়েছ নিখুঁৎ কেবল নিজে!/ মনের মতন সঙ্গী তোমার কপালে নাই লেখা/ তাইতে তোমায় কেউ পোঁছে না তাইতে থাক একা।' হাঁড়িচাঁচার জন্য আমরা আর সহানুভূতিশীল হই না। একই সঙ্গে কিন্তু তার অদৃষ্টকে, তার কপালের লিখনকেও দায়ী করে ছাড়ি। হাঁড়িচাঁচার প্রতি না হোক, তার করুণ পরিণতির প্রতি অটোমেটিকালি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ি। অজান্তেই। কবিতাটির নাম দেও 'সঙ্গীহারা'!

মনে পড়ে সেই হুলোর দশাও। বিদ্‌ঘুটে রাত্তিরে আকাশের আধখানা চাঁদ থেকে যার মনে পড়ে 'কাল' থেকে রেখে দেওয়া আধখানা মালপোয়ার কথা। অদম্য রসনা নিয়ে দুড়দুড় ছুটে গিয়েই সে যা দেখল, তাতে 'ধুক ক'রে নিভে গেল বুক ভরা আশা'। ঠোঁট চাটছে কানকাটা নেকী! মালপোয়া তার মুখস্ত— 'গালফোলা মুখে তার মালপোয়া ঠাসা'। হুলোর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। জীবন তার কাছে আগাগোড়া মিথ্যে! সে ভাবে, 'মন বলে আর কেন সংসারে থাকি/ বিল্‌কুল্‌ সব দেখি ভেল্‌কির ফাঁকি।' সুকুমারের ভেলকি এখানেই, যে এসবের মাঝেই ছোট্ট করে লেখেন, 'সব যেন খালি'! মালপোয়া-হীন জীবনের ফ্রাস্ট্রেশন কী আশ্চর্য ব্যাপ্তি পায়! শঙ্খ ঘোষ এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন— 'এই গোটা বিবরণটার মধ্যেই উতরোল মজা আছে, কিন্তু বিড়ালের জীবনের ফ্রাস্ট্রেশন কী আশ্চর্য ব্যাপ্তি পায়! শঙ্খ ঘোষ এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন— 'এই গোটা বিবরণটার মধ্যেই উতরোল মজা আছে, কিন্তু বিড়ালের জীবনের এই ট্রাজেডিটাকে

ধরবার জন্য এই ছন্দেও আছে আরেকটা ধ্বনির সংগতি, গোটা কবিতা জুড়ে একটা খুটখুট আওয়াজ। কী করে আসছে সেই আওয়াজ? এর প্রতিটি লাইননের প্রথম আর তৃতীয় পর্বের সূচনায় আছে একটি করে রুদ্ধদল, আর তার মধ্যে আবার আছে মিলেরও বিন্যাস, যেমন : চট করে মনে পড়ে মটকার কাছে/ মালপোয়া আধখানা কাল থেকে আছে।' অস্বীকারের উপায় নেই। সুর কি সহজে 'প্রাণফাটা' হয়?

কতগুলি মানুষকেও সুকুমার দেখিয়েছেন, এই কারুণ্য যাঁদের অলঙ্কার। অহঙ্কারও। কাঠবুড়ো। যিনি জানেন 'কোন কাঠে কেন থাকে গর্ত'। এও এক এক্সপার্টাইজ। অথচ কাঠবুড়োর এই জ্ঞান, দিবারাত্র কাঠ নিয়ে চর্চা, কেঠো পরিশ্রম আমাদের কাছে পাত্তা পায় না। 'টেকো মাথা তেতে ওঠে গায়ে ছোটে ঘর্ম,/ রেগে বলে, কেবা বোঝে এ সবের মর্ম?'

হেড্ অফিসের বড়বাবু। শান্ত মানুষটির মাথায় এ কোন অজানা ব্যামো! গোঁফ নয়, ঝিমোতে - ঝিমোতে নিজের আত্মপরিচয় খুঁইয়ে ফেলার তুমুল প্রশ্নটি তুলে ফেলেন তিনি। আমরা ভাবি ক্ষেপে উঠলেন। তাঁর কারণ অবস্থায় দেখে আমরা হাসি। মজা লুটি।

রাজা। কার্যতই কনফিউজ্ড। 'ঘেমে ঘেমে উঠছে ভিজে/ ভ্যাবাচাকা একলা নিজে,/ হিজিবিজি লিখছে কি যে, বুঝছে না কেউ একটুকু।' সেই একই; কমিউনিকেট না করতে পারা মানুষের সমস্যা। যাঁরা একলা, আরও একলা হয়ে পড়তে থাকেন।

এই বিচ্ছিন্নতা বোধ অ্যাবসার্ডিটির অন্যতম ফসল। যা থেকে জন্ম নেয় মন-খারাপের বিরল এক অনুভূতি। সুকুমার রায়ের লেখায় দু-লাইনের ফাঁকে এমন আরও বহু বিষাদ খেলা করে যার। আমরা হয়তো চিনতে পারি না। সুকুমার কিন্তু তাদের গুমঘরে ঢুকিয়ে রাখেন না। বরং আলতো ক্যামোফ্লেজের আশ্রয় নেন। কারণ, এরা সুকুমারের সন্তান। এরা সত্যকে জয় করছে। স্বীকার করছে! সুকুমারে স্পষ্ট পক্ষপাত এদের প্রতি। এমন সব উদ্ভট কাজকর্ম যাদের, আমাদের ঘড়িধরা দৈর্ঘ্য-প্রস্তু-উচ্চতার পৃথিবীতে তারা তো সংখ্যালঘু। নিঃসঙ্গ তো তারা হবেই। এই নিঃসঙ্গতারই হাত ধরেছিলেন সুকুমার। আর তাঁর ব্যঙ্গ ছিল সম্ভবত আমাদের নিয়ম- মাফিক জগতের উদ্দেশে। ক্লাসের ফার্স্ট বয়টি সুকুমারের কাহিনিতে নায়ক নয়। নায়ক ওয়ান অ্যান্ড ওনলি পাগলা দাশু। সুকুমারের এই পক্ষপাতের উল্লেখ মেলে লীলা মজুমদারের একটি লেখায়। 'বড়দা' প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন, 'নিজে নায়ক হতেন না। সবচেয়ে হাঁদা গঙ্গারামের ভূমিকায় সবচেয়ে ভাল অভিনয় দেখাতেন'। যা বিশ্বাস করতেন, তা-ই অভ্যাস করতেন। কাজেও তা-ই করতেন! হরিষে - বিষাদে লুকোচুরির খেলায় আত্মমগ্নতাকেও অন্যতম টুল হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন সুকুমার। কাঠবুড়ো, রাজা, কাতুকুতু বড়োর মতো বহু চরিত্রই শুধু আত্মমগ্নতা ও নিরলস প্রয়াসের জন্য হাসির খোরাক হয়ে উঠছে। তাদের মনেও হয়তো এ প্রশ্ন জেগেছিল। 'সকল লোকের মাঝে ব'সে/ আমার নিজের মুদ্রা দোষে/ আমি একা হতেছি আলাদা?' তবু আত্মমগ্নতা ব্যাহত হয়নি। কারুণের খেলাও এইখানে!

১৯৪৩ সালে দিলীপকুমার গুপ্তকে একটি চিঠিতে সুকুমার রায় প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশ লিখছেন, 'আমাদের এই পৃথিবীর ভিতরেই আরও অনেক পৃথিবী রয়েছে যেন। সাধারণ চোখ দিয়ে স্বভাবত তা খুঁজে পাওয়া যাবে এমন নয়। থাকে তা সৃষ্টিপরায়ণ মানসের ভিতর; এরাই আমাদের দেখান'। সুকুমারের বিষাদ, কারুণ্য, দুঃখ তেমনই এ-একটা পৃথিবী। অদ্ভুত এক মন-কেমন - করা আবেগ সেখানে কাজ করে। 'আয়রে যেথায় উধাও হাওয়ায়/ মন ভেসে যায় কোন সুদূর'। মনের নিয়মহারা হিসাবহীন ছবিটা আরও প্রকট হয় 'আবোল তাবোল' -এর শেষ কতিায়। 'আজকে দাদা যাবার আগে/ বলব্ যা মোর চিত্তে লাগে/ নাই বা তাহার অর্থ হোক্/ নাইবা বুঝুক বেবাক্ লোক'। এখানে আবার সেই আত্মমগ্ন মানুষগুলোর সঙ্গে প্রকাশ্যে এক প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে পড়েন সুকুমার রায়। কে কী ভাবল, যেখানে আর যায় আসে না। কিন্তু মৃত্যুর পরোয়ানাকেও কি পরোয়া করেন? সম্ভবত মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে ফিল করতে পারা, দেহের প্রতি কোষে মৃত্যুকে টের পাওয়া, আলোয় ঢাকা অন্ধকারেরই এ এক লাইভ টেলিকাস্ট। 'ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর,/ গানের পালা সাঙ্গ মোর'। এহেন স্বসাক্ষরিত আগাম ডেথ সার্টিফিকেট দেখে হাসি- কান্নার অনুভূতি গুলিয়ে যায়!

মৃত্যু সুকুমারের লেখায় আগেও এসেছে। হোক না হাসির আড়ালে। ষাট পেরোনো (বালাই ষাট!) নন্দ গোঁসাই -এর কথাই হোক বা 'গন্ধ বিচার -এর রাজসভার লোকজন। মৃত্যুভয় কী চিজ, সেখানে পরিষ্কার! মৃত্যুর ছায়া সুকুমার নিজেও অনুভব করেছিলেন। সে এক আশ্চর্য ঘটনা। একদিন রামমোহন লাইব্রেরিতে রামমোহন রায়ের উপর বক্তৃতা করে বাড়ি ফিরলেন সুকুমার। এসেই স্ত্রী সুপ্রভা দেবীকে বলেন, 'টুলু আমি বেশিদিন বাঁচব না। যখন লেকচার দিচ্ছি তখন যেন আমার ভেতর থেকে স্পিরিট বেরিয়ে গেল; আমি বুঝতে পারলাম যে, সে আমারই আত্মা'। সুকুমার রায়ের খুড়তুতো বোন মাধুরীলতা মহলানবিশ এই এক্সট্রাসেনসরি পারসেপশনের সাক্ষী।

ডেথ ট্রমা আরও ভয়াবহভাবে এসেছিল সুকুমারের জীবনে। মণ্ডা ক্লাবই শুধু নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল সুকুমারের। উভয়েরই ঘনিষ্ঠ হিরণকুমার সান্যাল বলেছেন, 'মানডে ক্ল্যাবের অধিবেশনে ধরা পড়ত, সুকুমার আর প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশের মধ্যে একটা আত্মিক যোগসূত্র; প্রশান্তচন্দ্র অনেক সময় যেন সুকুমার রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।' এই মানসিক আদান-প্রদানের সম্পর্কে এক

মারাত্মক দলিল আজও রয়ে গিছেয়ে। প্রশান্তচন্দ্রকে লেখা সুকুমারের এক 'Confidential' চিঠি। ২৩ আগস্ট, ১৯২০। তিনি লিখছেন — 'আশার কথা, আনন্দের কথা, optimism -এর কথা, একবর্ণও সত্যিসত্যি বিশ্বাস করি না। বারবার করে বলি, খুব বেশী বেশী করে বলি, এই জন্য যে বিশ্বাস করবার প্রবৃতি মনের মধ্যে আছে। আসলে মনে মনে যা বিশ্বাস করি তা ঠিক উল্টো —rampant, morbid out and out pessimism।...আমি কিছুদিন থেকে feel করছি যে আমার জীবনের মধ্যে একটা বড় crisis বা turning point আসছে। সেটা যে কি তা আমি ঠিক জানি না।...এই চিন্তা আমার মনের মধ্যে নতুন নয়, খুব অল্প বয়স থেকেই আমার মনে এইরকম একটা feeling আছে।'

এরপর স্তম্ভিত হওয়া ছাড়া, চুপ করে বসে থাকা ছাড়া উপায় কী? আরও মজার কথা এই, চিঠির উপরেই লেখা ছিল— 'এ চিঠির সব কথা প্রকাশ্য নয়— তা তুমি ভালই বুঝতে পারবে'।

যে সুকুমারের পরে আমাদের স্রেফ 'উঠ্ছে হাসি ভস্‌ভসিয়ে সোডার মতন পেট থেকে', মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর 'অবৈধ' সম্পর্কের কথা শুনে আমরা হকচকিয়ে যাই। সঙ্গে নিয়তি-নির্ধারিত কারুণ্যের অনুষঙ্গও থাকে স্বমহিমায়। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যু সত্যিই বয়ে আনে 'অকাল মৃত্যুর সকরুণতা'। আরও একটি কাকতালীয় ঘটনা উল্লেখযোগ্য— যে কালাজ্বরে মৃত্যু হয় সুকুমারের, ইউ এন ব্রহ্মচারীর সেই কালাজ্বরের ওষুধটির পেটেন্ট হয় সুকুমারের মৃত্যুর মাত্র এক বছর পরই! হায়!

কনফিডেনশিয়াল চিঠিতে সুকুমার যে কথা লিখেছিলেন তাকে তাৎক্ষণিক মনে না করাই শ্রেয়। 'এই চিন্তা আমার মধ্যে নতুন নয়'—বাক্যটি খুব ভুল না। 'ক্যাবলের পত্র' -তে লিখছেন, 'জীবনের একটা রূপ আছে, সেটা হচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ। কেন না, জীবনের ক্রিয়া সমাপ্ত হলেই মৃত্যু এবং মৃত্যুটা আর যাই হোক সেটা জীবন নয়। অসমাপিকা হলেও ক্রিয়পদটি অকর্মক নয়, কারণ ওর একটি উদ্দিষ্ট কর্ম আছে এবং সেই কর্মটি হচ্ছে আর্ট'। ব্যঙ্গ করে লেখা হলেও, মৃত্যুকে এভাবেই অস্বীকার করেছেন তিনি। কারণ 'জীবনের হিসাব' তিনি কড়ায় -গণ্ডায় বুঝতে চেয়েছেন— 'জীবনের দৈন্যের উপকল্পিত স্বর্গলোকের আবরণ দিয়া মানুষ অপরকে ভুলাইতে পারে, আপনাকেও ভুলাইতে পারে, কিন্তু জীবন তাহাতে প্রতারিত হয় না'। সত্যি কথার প্রতি, মোদ্দা কথার প্রতি সুকুমারের আসক্তি বারেবারে ফুটে উঠেছে। 'আসল কথা বুঝ্ছ না যে, করছ না যে চিন্তা, শুনছ না যে গানের মাঝে তব্‌লা বাজে ধিন্ তা?'

সুকুমার 'অতীতের ছবি' - তে লিখছেন, 'কোথাও আশার আলো কি নাহি?/ শুধুই সবার বদন চাহি'। এই 'বদন চাহি' শব্দবন্ধের মধ্যে ওই আসল কথা জানতে চাওয়ার আগ্রহ। 'জন্ম লভি জীব জীবন ধরে,/ কোথায় মিলায় মরণ পরে?' এমন অজস্র প্রশ্ন সুকুমারকে জর্জরিত করে তুলেছিল। 'চিরন্তন প্রশ্ন' লেখাটি এক কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। ''কল্যাণ কি?' 'গুড কি?' 'প্রোগ্রেস কি?' এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চিরপুরাতন প্রশ্ন আবার জাগিয়া ওঠে। সকল ক্ষেত্রেই মানুষের চিন্তা দ্বারে-দ্বারে আঘাত করিয়া ফিরিতেছে, 'এ প্রশ্নের সমাধান কোথায়?' এবং বার-বার একই উত্তর পাইতেছে, 'অন্বেষণ করিয়া দেখ'।" না, জর্জরিত নয়, সুকুমারকে মর্মরিত করেই তুলেছিল এই অন্বেষণ। এ লেখা শেষ হয় আরও বেসিক প্রশ্নে। ''আমরা চাই আর নাই চাই, ইচ্ছা করি আর নাই করি, অমোঘ প্রশ্ন যখন জাগ্রত হইয়াছে, সে যখন একবার এ পতিত জাতিকে এমনভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, 'কে তুমি? কোথায় চলিয়াছ? কি তোমার করিবার ছিল? আর কি-ই-বা করিতেছ?' তখন সে আমাদের জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতাকে নিংড়াইয়া তাহার জবাব আদায় না করিয়া ছাড়িবে না।

সুকুমারের মৃত্যুচেতনার কিছুটা আন্দাজ মেলে। সুকুমার তাঁর প্রশ্নের সম্মুখীন করেছিলেন জীবন ও মৃত্যু উভয়কেই। রবীন্দ্রনাথের মতো সুকুমারও লিখেছিলেন, 'জীবনে মরণে না রহে' ছেদ,/ ইহ-পরলোকে না রহে ভেদ'। দু-জনের কথাতেই জীবন-মৃত্যু একই সামতলিক ক্ষেত্র। কিন্তু সেই শুরু প্রশ্নের যদি ফেরা যয়। 'পরিপূর্ণ' মানে? (রচনার গোড়ার দিকে 'পরিপূর্ণ' শব্দ-দুটি 'দাগী'।) এখানে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর প্রেক্ষিতে 'জীবনমৃত্যু' -কে পরিপূর্ণ করে দেখার কথা বলেছেন, আর সুকুমার জীবনের প্রেক্ষিতে। তাই কখনও মৃত্যুর মুখোমুখি হলে সুকুমার হয়তো একটু থমকেছেন, কিন্তু তাকে আলাদা করে চিনতেও পেরেছেন। আমরাই আইডেন্টিফাই করতে পারিনি। বিরহ, দুঃখ, কারুণ্য, বিষাদ এক সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। আর তেতো ওষুধের উপর যেন চিনির প্রলেপ। আমাদের দারুণ লেগেছে, সারফেসের হাসির কথায় দেদার হেসে ফেলেছি! কিন্তু, অবচেতনকে চুরি করে একটু মন-খারাপও কখন যেন রয়ে গিয়েছে। মন - কেমন করেছে। বেচারাথেরিয়ামদের জন্য। গলার কাছটায় কী যেন আটকে থেকেছে। সেটা যে বাই এনি চান্স কান্না হতে পারে, ভাবতেও পারিনি। সুকুমার হয়তো বলতে চেয়েছেন—

'আছে শান্তি, আছে আনন্দ, আজি অনন্ত জাগে,
তবুও দুঃখ, তবুও মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে।।'

এক ভদ্রলোকের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে মৃত্যু প্রসঙ্গে সুকুমার রায় লিখেছিলেন, 'কি শান্তি! কি শান্তি! ভয়াবহ মৃত্যুর কি অপূর্ব সুন্দর মূর্তি!' অপূর্ব সুন্দর—কিন্তু সেই মূর্তি যে 'ভয়াবহ' মৃত্যুর, তা বারেবারে স্বীকার করেছেন সুকুমার রায়।

মৃতের নাম উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।